

স্কুলে দুপুরের খাবার পরিস্থিতি বদলে দেবে

প্রাথমিক শিক্ষা

আলী ইমাম মজুমদার

বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্কুল ফিডিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সামনে এসেছে। এ সম্পর্কে বলা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত দরিদ্র শ্রেণি থেকে আসা। তারা ভালোভাবে খেয়ে স্কুলে আসতে পারে না। স্কুলে খাবারের জন্য তেমন কিছু নিয়ে আসার সুযোগও নেই অনেকের। তাই দুপুরের দিকে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। হয়ে পড়ে অমনোযোগী। কেউবা বাড়ি চলে যায়। একটি অংশ একপর্যায়ে ছেড়েও দেয় লেখাপড়া। এতে করে পড়ার হার বাড়ে। শতভাগ লোককে শিক্ষিত করার স্বপ্ন অধরা থেকে যাচ্ছে। অথচ শিক্ষা খাতে বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য অনেক বছর যাবৎ সরকার বহু টাকা ব্যয় করে চলছে। তবে চাহিদার তুলনায় তা আদৌ পর্যাপ্ত নয়। অবশ্য সরকারের আর্থিক সংগতির সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। তা সত্ত্বেও স্কুল ফিডিং খাতটি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) তাদের এ প্রকল্প-সংক্রান্ত এক জরিপ প্রতিবেদনে উপবৃত্তির বদলে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি জোরদার করার পক্ষে মত দিয়েছে বলে স্থানীয় একটি দৈনিকে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, এটা যথাযথভাবে চালু করলে করে পড়ার হার প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে আসবে। আমরা এত কিছু করছি। এটাও করতে পারার কথা। সে দৈনিকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটানসহ এশিয়ার প্রায় সব দেশে প্রাথমিকের শিশুদের স্কুলে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। এমনকি আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোতেও শতভাগ শিশুকে দেওয়া হয় গরম খাবার। আর আমরা যে ১৭ শতাংশকে দিচ্ছি, তা-ও বিস্কুট।

বলা হয়, এ বিস্কুট থেকেই শিশুরা ৩৩৮ কিলো ক্যালরি খাদ্যপ্রাণ পেতে পারে। তবে জানা যায়, তারা এ বিস্কুট খেতে ততটা পছন্দ করে না। পছন্দ রান্না করা খাবার। এ অভিমত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সবারই। তবে বিস্কুট দিতেই শিশুপ্রতি দৈনিক খরচ পড়ছে নয় টাকার মতো। রান্না করা খাবার দিলে ২৫ টাকার কমে হবে না। সরকারের একার পক্ষে এ বিশাল কার্যক্রম নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এ খাত থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে। এখন তারা বরগুনার বামনা উপজেলা ও জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার স্কুলগুলোতে রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করে। তারা আরও ১০টি উপজেলায় বিস্কুটের মাধ্যমে এ কর্মসূচি চালায়। বাংলাদেশ সরকার এখন ৭২টি উপজেলায় তা চালাচ্ছে। এটা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হবে বলে জানা যায়। সেটা হোক, ভালো কথা। রাতারাতি কিছু করার সুযোগও নেই।

তবে ধীরে ধীরে দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলোতে দুপুরে রান্না করা খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জানা যায়, সরকারি কর্মসূচির বাইরেও গুটিকয় উপজেলায় স্থানীয় উদ্যোগে কিছু বিত্তবান ব্যক্তির সহায়তায় এ ধরনের কর্মসূচি চলছে। তাই হোক। গুরু যখন হয়েছে, আলোচিত হচ্ছে এর চাহিদা তখন একসময়ে সারা দেশেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দুপুরের খাবার পাবে। এতে স্কুলে অবস্থানের সময়কালও বাড়ানো যাবে। তাদের বাড়িতে গিয়ে যা পড়তে হয়, তার অনেক কিছুই স্কুলে পড়ে নিলে ফুরফুরে মেজাজে ঘরে ফিরবে। করবে খেলাধুলা। নতুন প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে পরদিন আবার আসবে স্কুলে। তবে এমনিতেই সব হয়ে যাবে না। উদ্যোগ নিতে হবে বহুমুখী।

যতটুকু জানা যায়, এ উপমহাদেশে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রথম চালু হয় ১৯২০ সালে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের একটি স্কুলে। পরে আরও তিনটিতে কর্মসূচিটি সম্প্রসারিত হয়। এতেই আটকে ছিল। এরপর স্বাধীন ভারতের সে রাজ্যের ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩—এ ১০ বছর দুই মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী কামরাজ গোট্টা শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের বিপ্লব আনেন। উল্লেখ্য, ভারতের বিখ্যাত এ রাজনৈতিক পিতার মৃত্যুর পর ১১ বছর বয়সে স্কুল থেকে করে পড়েন। তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞান ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক। তিনি গোট্টা রাজ্যে বিনা মূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং বিনা মূল্যে দুপুরে স্কুলে রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেন। তখন স্কুলে ছুটিছাটা কমিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ানো হয় কর্মঘণ্টা। দ্বিগুণ করা হয় শিক্ষকদের বেতন। বিপ্লবের সূচনা হয় শিক্ষা সম্প্রসারণে। তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার সময় রাজ্যের



শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৭। আর যখন দায়িত্ব ছাড়লেন তখন ৩৭ জন। আর সেটাও গুণগত শিক্ষা। তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপে শুধু মাদ্রাজ (আজকের তামিলনাড়ু)-নয়, গোটা দক্ষিণ ভারতে নয়া যুগের সূচনা হয়। শিক্ষা, বিশেষ করে গুণগত শিক্ষায় তারা সারা ভারতে অগ্রণী। এ সামাজিক খাতে বিনিয়োগ সুদূরপ্রসারী ও টেকসই সফল দেয়। বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। আমাদের দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে একটি স্থানে এসে দাঁড়ি ধীরে চলছে। আর গুণগত মান নিম্নমুখী বলে নিরন্তর বিভিন্ন মহল করছে অভিযোগ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের তৈরি খাবার সারা দেশে চালু করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনীতিতে একটি বড় ধরনের কার্যক্রমও চালু হবে। দেশে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৪ হাজার। এতে পড়াশোনা করছে দুই কোটি শিশু। তাদের খাদ্য সরবরাহ করতে স্থানীয় বাজার থেকে চাল, ডাল, তরিতরকারি, মসলা এবং সময়ে সময়ে মাছ, মাংস সংগ্রহ করা হবে নিয়মিত। এগুলোর বেচাকেনায় গ্রামীণ অর্থনীতি ইতিবাচক গতি পাবে। রান্না করার লোকের হবে কর্মসংস্থান। টাকার সংস্থান হলে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে শিক্ষকেরা এসব ব্যবস্থা করতে পারেন। তদারকি অবশ্যই থাকবে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের। কোথাও অনিয়ম হবে না, এমন নয়। তবে খুব একটা হবে এমনটাও মনে হয় না।

স্থানীয় বিত্তশালী লোকদের এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করলে তহবিলে কিছু অতিরিক্ত অর্থসংস্থান হতে পারে। এতে মাঝেমধ্যে ভালো খাবার দেওয়াও সম্ভব। এতে বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে আনন্দঘন। স্থানীয় শিশুদের উপস্থিতি হবে অনেকটা নিশ্চিত।

দেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি
ক্রমবর্ধমান। কর রাজস্ব দিন দিন
বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের
উদার হস্তে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ
থাকছে। ধীরেই শুরু হোক। এখন
যেগুলোতে বিস্কুট চলছে সেখানে
দিন তৈরি খাদ্য। বিস্কুটের আওতা
প্রসারিত করুন অন্যত্র

এতে শুধু শিক্ষার হারই নয়, গুণগত মান বাড়ারও সুযোগ সৃষ্টি হবে। স্কুলের ছুটি কিছুটা কমিয়ে পাঠদানকাল বাড়ালে এ বিষয়ে অবদান রাখবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদকে আকর্ষণীয় করতে স্বাধীনতা-পূর্বকালের অন্যান্য চাকরির তুলনায় এখন অনেক ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। দরকার হলে এবং সরকারের সামর্থ্য থাকলে তা আরও বাড়ানো হোক। তবে বিবেচনায় রাখা সংগত, তাঁরা কিন্তু দেশের কয়েক হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় এখনই ভালো অবস্থানে আছেন। তাঁদের কারও কারও ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে অমনোযোগী হওয়ার। দুর্গম স্থানগুলোতে তাঁদের অনুপস্থিতির হারও অনেক বেশি। জাতি তাঁদের জন্য অনেক কিছু করে চলছে। এ ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগররা আমাদের আর হতাশ না করে অধিকতর মনোযোগী হলে শিক্ষার মান ধীরে ধীরে বাড়ত।

চারদিকে যখন এ ক্ষেত্রে হতাশা শুরু, তখন কোনো কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবার ভিন্ন চিত্রও বিরাজ করছে। খবরের কাগজ থেকেই জানা যায় বগুড়ার শিবগঞ্জে মোকামতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা। ৮০০ শিক্ষার্থী এ বিদ্যালয়ে। ১৬ জন শিক্ষক। ছুটির দিনেও প্রায়ই বিশেষ ক্লাস হয়। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ক্লাস চলে। মাঝে এক ঘণ্টা টিফিনের ছুটি। তবে সম্ভবত স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় নেই বিদ্যালয়টি। এখানে ভর্তি হতে নিয়মিত পরীক্ষা দিয়ে সুযোগ পেতে হয়। অঙ্কলিট কিছুটা সংগতিসম্পন্ন লোকদের এলাকায়। তাই টিফিনের ছুটিতে বাড়ি থেকে আনা খাবার খায়। একই বেতনধারী শিক্ষকেরা তো অন্য বিদ্যালয়েও পড়াচ্ছেন। পদমর্যাদাও এক। আসলে দু-একজন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সহযোগিতার হাত বাড়ায় অন্যরা। দ্রুতই ধরা দেয় সাফল্য। এরপর মোকামতলা হয়তো দেশের আরও বেশ কিছু স্থানে থাকতে পারে। তাদের সবার খবর পৌঁছায় না আমাদের কাছে।

আলোচনাটা মূলত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরে তৈরি খাবার সরবরাহ নিয়ে। এর বিপক্ষে বোধ হয় কেবল সরকারের আর্থিক সংগতির অভাব ব্যতিরেকে ভিন্ন কোনো জোরালো যুক্তি নেই। দেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান। কর রাজস্ব দিন দিন বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের উদার হস্তে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকছে। ধীরেই শুরু হোক। এখন যেগুলোতে বিস্কুট চলছে সেখানে দিন তৈরি খাদ্য। বিস্কুটের আওতা প্রসারিত করুন অন্যত্র। তৈরি খাবার যাদের দেওয়া হবে, সেখানে উপবৃত্তি বন্ধ করলেও কিছু টাকা আসবে। কিন্তু খুবই উপকৃত হবে এ টাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবারের আওতায় আসা ছাত্রছাত্রীরা।

● আলী ইমাম মজুমদার : সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
majumderali1950@gmail.com